# মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু: মানবতা ও মানুষের মুক্তির প্রতি অঙ্গীকার

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা বর্তমানে বিশ্বে যে যে দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে তার প্রেক্ষাপট ও কারণ শনাক্ত করব। এরপর বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানব। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করে সাদৃশ্য বা মিল বের করব। সবশেষে, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবসে একটি 'স্বাধীনতা মেলা' এর আয়োজন করব। এই মেলাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল উপস্থাপন করব।

আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। আমরা জানি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এই যুদ্ধ নয় মাস ব্যাপী হলেও এর বীজ বপন হয়েছিল অনেক আগে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা এই সম্পর্কে কিছুটা জেনেছি । এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা  আরও বিস্তারিত জানব।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো পৃথিবীতে বর্তমানে কয়েকটি দেশে যুদ্ধ চলছে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি কোন কোন দেশে এই যুদ্ধ হচ্ছে। এই যুদ্ধ কেনো সংঘটিত হচ্ছে সে বিষয়েও কিছুটা ধারণা আছে। চলো আমরা দলগত কাজের মাধ্যমে সেইসব যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নিই ।

**দলগত কাজ ১:**

এই শিখন অভিজ্ঞতার দলীয় কাজগুলো করার জন্য আমরা নতুন করে ৫-৬ জনের একটি দল গঠন করি। দলে বসে আমরা বর্তমান বিশ্বে কোন কোন দেশে যুদ্ধ হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করি। বিভিন্ন উৎস যেমন:সংবাদপত্র/ বই ইত্যাদি থেকে তথ্য নিই। এরপর দলে আলোচনা করে আমরা সেই সব দেশে কেনো যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে তা নিচের ছকে লিখি। প্রতিদল থেকে ১-২ জনকে আমরা নির্বাচিত করব আমাদের দলীয় কাজ  উপস্থাপন করার জন্য।

| বর্তমানে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধ | কেনো এই যুদ্ধ হচ্ছে |
|---|---|
| | |

**এখন আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বিষয় জেনে নিই।**

বাংলা অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস কত হাজার বছরের পুরোনো? নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের? আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগেও যে বাংলা অঞ্চলে মানুষের বিচরণ ছিল, তা আমরা ইতিহাসের অন্য অধ্যায়গুলো পাঠ করে ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছি। আদিকালে বাংলা অঞ্চলে নানান স্থানের নানান রকমের মানুষ একের পর এক বসতি স্থাপন করেছে। বাংলার বিশেষ ভূপ্রকৃতি তাঁদেরকে দিয়েছে নানান সুবিধা-অসুবিধা আর টিকে থাকার পথে নানান রকমের প্রতিবন্ধকতা।

বাংলায় মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস তাই একদল মানুষের নিজস্ব প্রাণশক্তির ইতিহাস। দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর সমন্বয়ের বৈচিত্র্যে সাজানো ইতিহাস। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার পাশাপাশি বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড়ো আরও একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নানান রাজশক্তির আগমন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাত থেকে ১৯৭১ সালে আসে মুক্তি, আসে স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী একজন নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে তাঁর মতো আর কোনো নেতাকে আমরা পাইনি যিনি বাংলার মাটি-পানি-কাদা আর ঝড়বৃষ্টির পরিবেশ থেকে উঠে এসে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই ভূখণ্ডের এক অতি সাধারণ পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন। আমৃত্যু তিনি সাধারণ মানুষের জন্যই কাজ করে গেছেন।

ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ লুট করে নেয়ার জন্য এমনকিছু নীতি গ্রহণ করেছিল যার অনিবার্য পরিণতিতে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, কারিগরসহ সকল সাধারণ পেশাজীবী মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ফলে ব্রিটিশ শাসক ও তাঁদের অনুগত জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে মানুষ সশস্ত্র প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত হতে থাকে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলনসহ নানান প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন এই সময় সংঘটিত হয়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে এই সময় ভারত ভাগ করে তৈরি করা হয় ভারত ও পাকিস্তান নামের পৃথক দুটি রাষ্ট্র। একই কারণ দেখিয়ে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের একটি অংশকেও যুক্ত করা হয় দুই হাজার দুইশ কিলোমিটার দূরবর্তী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলার দুই অংশের মধ্যেই নানান ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির মানুষের বসতি ছিল। একই সঙ্গে ছিল একই ধর্মের নানান তরিকার মানুষের বসতি। এই বৈচিত্র্য আর বহুত্বের বাস্তবতার মধ্যেই দেশভাগ করে হিন্দু আর মুসলমানের নামে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করা হয়। বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশের (পূর্ব বাংলার) মানুষ পাকিস্তান শাসন কাঠামোর অধীনে নতুন এক শোষণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের

শাসকেরা বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সকল সুবিধা নিজেদের দখলে নেয়। বাংলার পূর্বাংশের মানুষের সঙ্গে প্রভূর মতো আচরণে লিপ্ত হয়। ফলে পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে চরম বিক্ষোভ তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালের পর থেকেই শুরু হয় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্ত করার লড়াই। আর বাংলার মানুষের এই লড়াই ও সংগ্রামে যিনি অগ্রভাগে থেকে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন , তিনি হলেন তাঁদের আপনজন, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

## বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ অত্যাচারী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এজন্যই ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এই বিজয় ক্ষমতালোভী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিজয়। খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, কারিগরসহ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের বিজয়। এই বিজয়ের পথ সহজ ছিল না। এর পেছনে রয়েছে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের এক দীর্ঘ ইতিহাস। বাংলার জল-কাদা-পলিমাটি থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবিকতা, সাহস আর আত্মত্যাগের ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসা থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে ভালোবাসা জানাচ্ছেন। পেছনে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা। ছবির সময়কাল: ২৩ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইংরেজ শাসিত 'ব্রিটিশ ভারত' উপনিবেশের পূর্ব-প্রান্তে বাংলা নামক একটি প্রদেশের (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) পূর্ব অংশে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, বর্তমানে গোপালগঞ্জ পৃথক একটি জেলা হিসাবে বিদ্যমান। দিনটা ছিল ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশ ভারতের বিশেষ এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করে মুক্তি লাভের জন্য ভারতের চারিদিকে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে মাত্র ষোলো বছর বয়সেই শেখ মুজিবের ভেতর এই চেতনা জাগ্রত হয় যে, স্বাধীনতা আনতে হবে। এই দেশে ইংরেজদের থাকার কোনো অধিকার নেই। বঙ্গবন্ধু তখন নিয়মিত স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শুনতেন। স্বদেশী আন্দোলন হলো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যা ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল। নবম আর দশম শ্রেণিতে এ বিষয়ে তোমরা বিস্তারিত পরিসরে জানতে পারবে।

কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ সভায় তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান (পেছনে দাঁড়ানো) এবং হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৭)।

ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষের প্রতি ছিল বঙ্গবন্ধুর দরদ। ১৯৪৭ সালের আগে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং মহামারির সময় শেখ মুজিব হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধসহ সকলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষ পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দাঙ্গায় উগ্রবাদী হিন্দুদের থেকে সাধারণ মুসলমানদের

এবং উগ্রবাদী মুসলমানদের হাত থেকে সাধারণ হিন্দুদের রক্ষা করেছেন। ১৯৪৭ সালে তরুণ ছাত্রনেতা হিসাবে শেখ মুজিব হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রায়টের বিরুদ্ধে কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদকে সমর্থন করেন।

১৯৪৮ সালেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী তথাকথিত অভিজাত শাসকেরা বাংলার পূর্ব অংশের মানুষের ওপর নতুন করে শোষণের এক জাল বিস্তারের নীলনকশা আঁকতে শুরু করেছেন। শেখ মুজিব বুঝতে পারেন, পাকিস্তান নামের নতুন এই কাঠামো কেবলই শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের এক রাজনৈতিক খোলস বদল মাত্র। তিনি পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর প্রথম আঘাত আসে ভাষার প্রশ্নে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় উর্দুভাষী নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন। পূর্ব বাংলার সচেতন রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা-সমাবেশ শুরু করেন। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন তীব্র রূপ লাভ করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে এইদিন ঢাকা শহর মুখর হয়ে ওঠে। সারা দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিল এবং ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থী, সচেতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছায়। পাকিস্তানি শাসকেরা এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিতে পুলিশি নির্যাতনের পথ বেছে নেন। মিছিল ও ধর্মঘটে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থী-জনতার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। শেখ মুজিব, অলি আহাদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা সহ অনেককেই সমাবেশ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয় এবং কারাগারে বন্দি করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টন ময়দানের এক জনসমাবেশে 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে আবারও ঘোষণা দেন। ফলে ভাষার দাবিতে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে চলমান বিক্ষোভ আন্দোলন আবারও তীব্র রূপ ধারণ করে। জেলে বসেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষার দাবিতে চলমান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করতেন। ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু অনশন শুরু করেন। মৃত্যু অবধি না ভাঙার শপথ নিয়ে শুরু করা এই অনশন ১১ দিন ধরে অব্যাহত থাকলে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশ তাতে নির্বিচার গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ অনেকে। জেল থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষাশহিদদের প্রতি শোক জানান এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ভাষাশহিদদের স্মরণে আয়োজিত ভোরের র‍্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং তাজউদ্দীন আহমদ। ছবির সময়কাল: একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী", "কারাগারের রোজনামচা", এবং "আমার দেখা নয়াচীন"- গ্রন্থগুলো পাঠ করলে বিক্ষোভ, সংগ্রাম, মিছিল ও প্রতিবাদে মুখর উত্তাল এই দিনগুলোর চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আত্মিক সম্পর্ক, পাকিস্তানের শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বাংলার মেহনতি কৃষক, শ্রমিকসহ প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তির পথ অনুসন্ধান এবং সেই লক্ষ্যে সমস্ত দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বঙ্গবন্ধু শুনেছেন। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে বারবার জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সময়কালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাঁকে দমানো যায়নি। কেননা, বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের সব রকম অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে ততদিনে প্রতিবাদ করতে শিখে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তারা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। ক্রমে ক্রমে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পরম আস্থা এবং নির্ভরতার প্রতীক।

কারামুক্ত হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বক্তব্য রাখছেন শেখ মুজিবুর রহমান (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২) ।

১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সমমনা কিছু দল ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি ছিল ২১ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৫ মে নতুন প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্টের সাফল্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার সুনজরে দেখেনি। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয় এবং সে বছর ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত তাকে জেলে আটকে রাখা হয়।

সেই কিশোর বয়স থেকেই আমরা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে মানবতার গুণাবলি প্রকাশ পেতে দেখেছি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি চাইতেন তিনি। পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যেতেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম থেকে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহার করে দলের নাম রাখা হয় আওয়ামী লীগ। ১৯৫৬ সালে খান আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু এই দায়িত্বেও বেশিদিন থাকেননি। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে আরও বেশি সুসংহত ও জোরদার করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়। এই সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এসব উচ্চাভিলাষী শাসকদের পথের কাঁটা। শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য তিনি কাজ করছিলেন। তাঁকে দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করতে থাকে। টানা ১৪ মাস জেলে বন্দি রেখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, আবার সেই জেল গেট থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী কয়েক বছর ধরেই পাকিস্তানের জান্তা সরকার এভাবে নানান মিথ্যা মামলায় শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখে। মুক্ত হবার পর শেখ মুজিব আবারও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। বাংলার আপামর মানুষকে নিয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে বঙ্গবন্ধু ‘৬ দফা দাবি’ নামে একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। প্রস্তাবিত এই ৬ দফা ছিল **বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ**। মানুষের জন্য মুক্তির বার্তা। ৬ দফার পক্ষে দেশজুড়ে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। শেখ মুজিব বাংলার নদী আর কাদামাটির পথে ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। গণসংযোগ করেন। মানুষের এই ব্যাপক সমর্থন পাকিস্তানি শাসকদের অস্তিত্বের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯৬৬ সালেই সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় গণ সংযোগ চলাকালে বঙ্গবন্ধুকে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করা হয়। নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেপ্তার করা হলে বাংলার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সঙ্গে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘটের মধ্যে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। এসব হত্যা এবং দমননীতি দিয়েও বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে আটকে রাখা যায়নি।

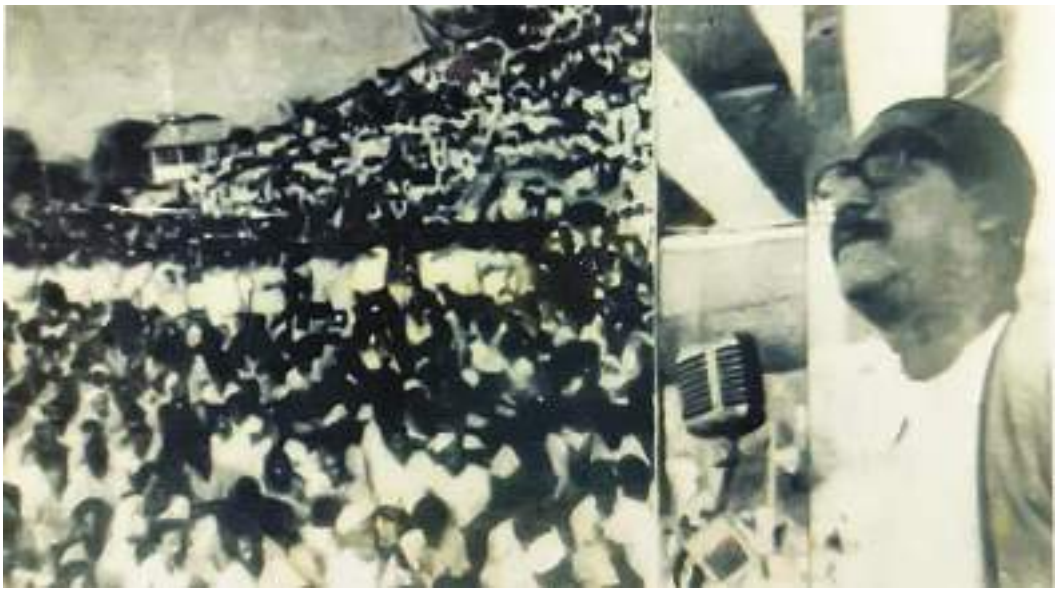

১৯৬৬ সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ৬ দফা কর্মসূচির সমর্থনে বক্তৃতা করছেন

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। বঙ্গবন্ধু এই অভিযোগে আবারও গ্রেপ্তার হন। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী শিক্ষার্থী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, কামার-কুমারসহ আপামর জনতা যোগ দেয়। দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। জনগণের এই চাপের মুখে পাকিস্তানি শাসকেরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে ১৯৬৯ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সংবর্ধনা সভাতেই কয়েক লক্ষ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় লাখো মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধি প্রদান করা হয়।

১৯৬৯ সালেই ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর ষষ্ট মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’। তিনি বলেন —

> “এক সময় এদেশের বুক হতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হতে ‘বাংলা’ কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। .... একমাত্র ‘বঙ্গোপসাগর’ ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে ‘বাংলা’ কথাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ...জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান’ -এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘বাংলাদেশ’।“

এভাবেই ‘বাংলাদেশ’ আমাদের হলো। সাধারণ মানুষের মুক্তির চিন্তায় নিবেদিতপ্রাণ একজন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামে একটি দেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস তৈরি হলো।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী-ক্ষমতালোভী শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের এই রায় দেখে বিচলিত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য তারা নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের এই ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার প্রতিবাদে দেশজুড়ে হরতাল, সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে এত সহজে বাংলার মানুষের মুক্তি মিলবে না।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। শোষণমুক্তি এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি প্রকারান্তরে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিতাড়িত করে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের ঘোষণা দেন। রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো মানুষের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।” বাংলার মানুষকে মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন, “প্রতিটি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।”

৭ মার্চ, ১৯৭১, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম’– রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিকামী লাখো মানুষের মহাসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ১৮ মিনিটের এই ভাষণকে ইউনেস্কো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বা “ডকুমেন্টারি হেরিটেজ” ঘোষণা করেছে।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একদিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ, অন্যদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। বাংলার মানুষ ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অফিস, আদালত, ব্যাংক, বিমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা চালাতে শুরু করে। এর ফলে ইয়াহিয়া খানের শাসনব্যবস্থা ধসে যায়। পাকিস্তান সরকার পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাতে বাংলার নিরীহ মানুষের ওপর মরণাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের নির্মমতম ও বর্বর গণহত্যা চালায়। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে (২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে) পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এই ঘোষণা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

**বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:**

‘এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।’
**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (প্রকাশ সাল জুন ২০১২, পৃষ্ঠা-২৯৯)**

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা শুনে দেশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। রাত ১টা ৩০মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনদিন পর বন্দি অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের লয়ালপুর জেলখানায়।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি জনগণের ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করলেও মুক্তির চেতনা থেকে তাঁদের সরাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। গণপরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এপ্রিলের ১৭ তারিখ এই সরকার মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমান মুজিবনগর) শপথ গ্রহণ করে।

দীর্ঘ ৯ মাস ধরে একদিকে পাকিস্তানি হায়নাদের অত্যাচার, নির্যাতন, দমন-পীড়ন, অন্যদিকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম চলতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ৯ মাসে প্রায় ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, লক্ষ লক্ষ মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে, বাংলার অসংখ্য ঘরবাড়ি আর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে এতকিছু করেও তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম আর ঘর থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিক, জনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে তাঁদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং পাকিস্তানের শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে মুক্তি আর বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দখলদার পাকিস্তানি সেনাদের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

যুদ্ধের সময় এবং পরাজয়ের পরেও পাকিস্তান সরকার মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদদের চাপের কারণে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। ১২ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দেশ গড়ার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

## মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে নিয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেটুকু তথ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ তাঁর আলোকে চলো মুক্তমনে বিষয়টা নিয়ে ভাবি। মানুষের মুক্তি এবং নিজের মতো করে বাঁচা ও জীবন গঠনের স্বাধীনতাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমার ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি আর জীবন-যাপনের স্বাধীনতা, ধর্ম-বর্ণ-ভাষানির্বিশেষে সকল মানুষ মিলেমিশে আনন্দে বেঁচে থাকার অধিকার, নিজের দেশ নিজে গড়ে তোলার স্বাধীনতা আর সর্বপ্রকার অর্থে মুক্তির নিশ্চয়তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনায় আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলব। বঙ্গবন্ধু নিজে এই চেতনায় বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা মাঠে-খামারে কৃষকের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছিল। কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজেদের যুক্ত করেছিল। গ্রামের পর গ্রাম নিরক্ষরতা দূর করতে দিন-রাত শিক্ষার্থীরা কাজ করেছে। এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে, শহরে, পাড়ায়, মহল্লায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের যুদ্ধে আহত একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন।
স্থান: ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ছবির সময়কাল: ১৯৭২

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মানুষের কল্যাণে নিজ হাতে স্বদেশ গড়ে তোলার বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

যাহোক, বাংলায় মানুষের ওপর হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শাসক এবং সবশেষে পাকিস্তানি শাসকদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন আর শোষণের কথা তোমাদের সকলের এখন জানা। বাংলার সাধারণ মানুষ কীভাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতালিপ্সু শাসকদের বিতাড়িত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে তারও কিছু কিছু অনুধাবন করেছ।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই ঠিক একইভাবে অত্যাচারী ও ক্ষমতালোভী রাজা, যোদ্ধা ও শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলিভিয়া, কলম্বিয়া, তিউনিসিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকার নাম বলতে পারি। আবার অনেক দেশ রয়েছে, যেখানে এখনও মানুষ নিজের ভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে নানান জায়গায় যুগে যুগে নানান রাজশক্তির উদয় হয়েছে। তবে ইতিহাস পাঠ থেকে তোমাদের এই উপলব্ধি হবে যে, সাধারণ মানুষের ওপর কোনো রাজশক্তি অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে, মানুষকে শোষণ করে তৈরি করা ক্ষমতার প্রাসাদ এক সময় সাধারণ মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের ফলেই ভেঙে যেতে বাধ্য।

আর একটা তথ্য তোমাদের জানাই। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতের দলে।'

## ভিয়েতনাম যুদ্ধ

ভিয়েতনাম হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলধারার তীর ঘেঁষে অবস্থিত সবুজ-শ্যামল এই দেশটি। বাংলাদেশের মতোই ভিয়েতনামের মানুষদের রয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস। দীর্ঘ কয়েক দশকের সংগ্রাম আর নানান ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে ক্ষমতালোভী শাসকদের বিতাড়িত করে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভিয়েতনাম ছিল ফ্রান্সের দখলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ফ্রান্সের পাশাপাশি ভিয়েতনামে জাপানের আধিপত্যও শুরু হয়। ফ্রান্স এবং জাপান — এই দুইটি দেশে ভিয়েতনামের ওপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এই দুইটি দেশ ভিয়েতনামকে ভাগাভাগি করে শাসন শুরু করে।

ঔপনিবেশিক এই শাসকদের আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য হো চি মিন নামক ভিয়েতনামের একজন বিপ্লবী নেতা একটি স্বাধীনতা সংঘ গঠন করেন। এই সংঘের নাম দেওয়া হয় 'ভিয়েত মিন'। এই সংগঠনে যোগদান করে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষ জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। ১৯৪৩ সালের দিকে এই যুদ্ধ শুরু করে তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান দুর্বল হতে শুরু করে। ১৯৪৫ সালে হো চি মিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুক্তিকামী মানুষেরা ভিয়েতনামের বিভিন্ন অংশ বিদেশি শাসকদের দখল থেকে মুক্ত করে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসতে শুরু করেন। কিন্তু এই মুক্তির পথে আবারও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ফরাসি শক্তি। ফ্রান্সের সৈন্যরা ভিয়েতনামের দক্ষিণ ভাগ দখল করে নিজেদের মনোনীত শাসককে ক্ষমতায় বসায়। ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশে ফরাসিদের আধিপত্য আবারও শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। ১৯৫৪ সালে ভিয়েত মিন সংঘের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে চূড়ান্ত আঘাত এবং ফরাসি শক্তিকে পরাজিত করে। কিন্তু এইখানেই এই যুদ্ধের অবসান ঘটেনি। ১৯৫৪ সালে এক চুক্তির মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামকে দুইভাগ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাচর্চা শুরু হয়। উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবী মানুষের প্রতি রাশিয়া এবং চীনের সহানুভূতি ছিল। মূলত এই কারণেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে মরিয়া হয়ে ওঠে। রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ছিল বেশকিছু আদর্শগত দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের জের ধরেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের প্রভাব জোরদার করে। সমগ্র ভিয়েতনাম যাতে একত্রিত হতে না পারে সেই লক্ষ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্ত্র এবং সৈন্য প্রেরণ করে। একদিকে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার লড়াই, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা চর্চার লড়াই। এই লড়াই ১৯৬৩ সালের দিকে শুরু হয় এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তা চলতে থাকে। মার্কিন সৈন্যরা অস্ত্র এবং সমরবিদ্যায় উন্নত ছিল। তারা ভিয়েতনামের উত্তর অংশে হামলা করে চিরতরে বিনাশ করে দিতে চেয়েছিল। মার্কিন সেনাদের আক্রমণে ভিয়েতনামের হাজার হাজার যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে। বোমার আঘাতে দেশের অধিকাংশ জায়গা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। কিন্তু এতকিছুর পরেও ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষেরা লড়াই থেকে সরে যায়নি। হত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও তারা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। অত্যাচারী শাসকদের থেকে মুক্তি লাভের অদম্য বাসনা আর দেশপ্রেম ছিল ভিয়েতনামের যোদ্ধাদের প্রধান শক্তি। আর এই কারণেই যুদ্ধের রসদ, অর্থ এবং সমরবিদ্যায় এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যোদ্ধারা হার মানতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ভিয়েতনামের মানুষেরা বিদেশি শাসকদের আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে। উত্তর ও দক্ষিণ অংশ একত্রিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম ভিয়েতনাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই দুইটি বিশেষ ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একদল মানুষ নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেদের টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে গেছে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলেমিশে সুন্দর একটা জীবন পরিচালনা করেছে। অন্য একদল মানুষ বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবহর নিয়ে সেইসব সাধারণ মানুষের ওপর দখলদারিত্ব করেছে। এসবের ফলে মানুষের জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। মানবতা হয়েছে ভুলুণ্ঠিত। শাসকের অত্যাচার আর শোষণে জর্জরিত হয়েছে জনজীবন। বাংলা অঞ্চল আর ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাসেও একই ঘটনা ঘটেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অকল্পনীয় অবদান ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে অনেক বিষয় জানলাম। চলো তাহলে আমরা এখন আরেকটি দলগত কাজ করি।

### দলগত কাজ ২:

দলে বসে আমরা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করি। এরপর বিশ্বের যেকোনো একটি বা দুটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করি। এই জন্য আমরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে তথ্য নিতে পারি। এছাড়াও বিভিন্ন বই/পত্রিকা/আর্টিকেল থেকেও তথ্য নিতে পারি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাদৃশ্য বের করি। এরপর আমরা দলীয় কাজ উপস্থাপন করি। এই উপস্থাপনার জন্য নতুন ১-২ জনকে নির্বাচন করি।

| | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ | পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যুদ্ধ |
|---|---|---|
| যুদ্ধের কারণ | | |
| নেতৃত্ব দিচ্ছেন যিনি/যাঁরা | | |
| যোদ্ধা | | |
| মিত্রপক্ষ | | |
| শত্রুপক্ষ | | |
| যুদ্ধের ফলাফল | | |

আমরা দলগত কাজটি করে বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মিল আছে। সবাই শোষণ ও নীপিড়ন থেকে মুক্তির জন্য শাসক বা শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বঙ্গবন্ধুর মতো আমরা নিজেরাও শোষিতের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করব। আমরা প্রত্যাশা করব, একদিন মানবতার জয় হবে। সকল ভেদাভেদ দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষের জয় হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছে।

### দলগত কাজ ৩:

দলগতভাবে আমরা আরেকটি কাজ করব। আমরা এর আগের ক্লাসের এক বা দুটি অন্য দেশের যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত খুঁজে বের করেছি। এখন একটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল অনুসন্ধান করব। আমরা অনেক তথ্য বিগত ক্লাসের দলগত আলোচনায় খুঁজে পেয়েছি। এইবার প্রয়োজনে আরও একটু ভালোভাবে অনুসন্ধান করব। এরপর প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি নাটিকা/ পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি যেকোনো মাধ্যমে দলগতভাবে উপস্থাপন করব। এই উপস্থাপনার জন্য আমরা **'স্বাধীনতা মেলা'** এর আয়োজন করব। লক্ষ্য রাখব মেলাটি যেনো ২৬শে মার্চের দিন আয়োজন করা হয়।